বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আম আঁটির ভেঁপু



সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

দ্বাদশ সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৭০
প্রকাশক
নন্দিনী গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
২৫। ৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট ও ছবি
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
শ্রী দুর্গাপদ ঘোষ
অরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
দি নিউ প্রাইমা প্রেস
১১ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা ১৩
বাঁধিয়েছেন
ভারতী বাইণ্ডিং সেণ্টার
৬। ১ রমানাথ কবিরাজ লেন
কলকাতা ১৩

আম আঁটির ভেঁপু



* * * * * * * * * *

এক ॥ কুঠির মাঠ

* * * * * * * * * *

মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল—ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল —ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে। নাও এগিয়ে চল—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড়-বড় কান? হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল— কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়-বড় কান?

হরিহর বলিল— কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তুর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা

কি, ওটা কি ; কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেছি ?···
নাও এগিয়ে চল দিকি—

বালক বাবার কথায় আগে-আগে চলিল।

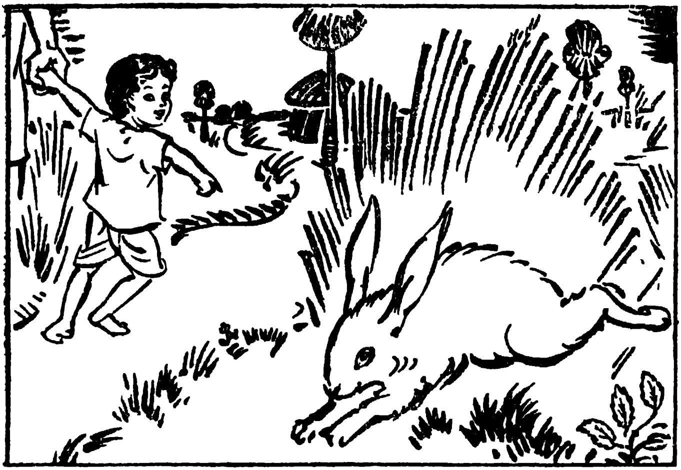
হঠাৎ এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে-করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, ছাখো বাবা, ঐ গেল বাবা বড়-বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—উঁহু-উঁহু—উঁ—কাঁটা-কাঁটা-কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশোবার বারণ কচ্চি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না ? বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা ? হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি ? শুওর টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

—শুওর না বাবা, ছোট্ট যে—পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল-চল—হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি।···

নবীন পালিত বলিল—ও হল খরগোস, খোকা, খরগোস। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোস থাকে, তাই। বালক বর্ণ পরিচয়ের 'খ'-এ খরগোসের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার



সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোস!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাঁচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোস!! এই রকমই ভাটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! জল মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে-ঘেরা সরুপথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে-বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ

করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাড়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখি কৈ বাবা?

—এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নিচু-নিচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল।

হরিহর বলিল—কুঠি-কুঠি বলছিলে, ঐ দ্যাখো, খোকা, সাহেবদের কুঠি—দেখচো?

নদীর ধারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড় জোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের

সীমা; কেবল এতদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া, সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বাল-ঘরটার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিত, আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল—হাঁ হাঁ হাত দিও না, হাত দিও না—আল্‌কুশি-আল্‌কুশি। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে হাতে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে, তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

—হাত চুলকুবে কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ-বিষ—আল্‌কুশিতে কি হাত দেয় বাবা?

শুঁয়ো ফুটে রি-রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল! সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না-একটা দোলাই গায়ে না-কিছু!

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায় ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আল্‌কুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন হল তো কুঠির মাঠ দেখা?

* * * * * * * * * *

দুই ॥ আমের কুসি

* * * * * * * * * *

সকাল বেলা! আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে।

এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—

সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত।

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা-পাতলা, রঙ অপুর মতো এতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাঁচের

চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর-ডাগর।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে? দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি-চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জরাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথা পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়েছিল। আন্ দিকি একটু নুন আর তেল!

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসী!

তুই যা না শিগগির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগগির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো, তুই খিড়কি দোরে গিয়ে ছ্যাখ মা আসচে কি না। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল-টেল যেন মেজেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি নইলে মা টের পাবে, তুই তো একটা হাবা ছেলে!

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত্।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?—

—অতগুলো বুঝি হল? এই তো—ভারি বেশি—যা, আচ্ছা নে আর দুখানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে–একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি। মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন। পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে, দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে।

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানে খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতে-



ছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে-খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল না বাঁদর—নুন লেগে রয়েচে যে!

পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায়-পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—রোসো, রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু, একটুখানি হাঁপ ছাড়তে দাও। তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাইফরমাজ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখতো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন? খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত-সুরে বলিল —চাল-ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে-খাইতে বলিল—উঃ চিবনো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগগেস করো না? আমি এই তো এখন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো—স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা, ডেকে-ডেকে সারা হল। কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে-পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েচে! আর কোনোদিন আম দেবো—ছাই দেবো! এই ওবেলাই পটুলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জরাবো, এত বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়, খেও এখন! হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখছিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্চে।

—দুগ্‌গা বুঝি—

—সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে—সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে! কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরচে—এই চত্তির মাসের রদ্দুর! ফের ছাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে। অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

* * * * * * * * * * *

তিন ॥ গ্রীষ্ম-দুপুর

* * * * * * * * * * *

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে-মাঝে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক—দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়। কোন দেশ এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মায়ের মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে!

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়-মাখানো আনন্দভাবের সৃষ্টি করিত। এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা যখন তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া যেন কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে, ঠিক সেই সময় মায়ের জন্য তাহার মন বড় কেমন করিয়া উঠিত; হঠাৎ তাহার মনে হইত যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে! আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—আরও ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে!

চাহিয়া দেখিতে-দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাড়ি হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—গ্যাখো-গ্যাখো ছেলের কাণ্ড গ্যাখো! ছাড়্—ছাড়্—দেখেচিস্ সকৃড়ি-হাত? · ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার! তোমার জন্যে এই গ্যাখো চিংড়ি মাছ ভাজচি—তুমি যে চিংড়ি মাছ ভাজা ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করো না—ছাড়ো ··

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো-কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে-লিখিতে একমনে মায়ের মুখে মহাভারত—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হইয়া যায়। বেলা পড়িলে, মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক-এক দিন চাহিয়া দেখে—কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে, আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনো মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে···রোজই তোলে···রোজই তোলে···

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা

আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হাল্‌কা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশ-বাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর ওঃ সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ!···বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! তারপর অর্জুন করলেন কি, ঢাল আর তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ!···দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না!

গ্রীষ্মকালের দিন—বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের দিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ও কিরে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বকচিস্‌

বিড়-বিড় করে, আর হাত-পা নাড়চিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভায়ের কচিগালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!···কোথাকার একটা পাগল, কি বকছিলি রে আপন মনে? অপু লজ্জিতমুখে বার-বার বলিতে লাগিল—যাঃ, বকছিলাম বুঝি? আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—পরে সে তাহার হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখচিস্? কত নোনা পেকেচে? এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি—

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি! একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর্, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুসিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুসি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আনচি—

অপু আঁকুসি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না। খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল দুর্গা আঁকুসি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো, মা'র হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুসিটা নে। নোলক

পরবি ? একটা নিচু ঝোপের মাথায় ওড়্-কল্‌মি লতায় শাদা শাদা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি। তাহার দিদি ওড়্-কল্‌মি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে-মনে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে—নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই ; কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায় ; এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের উভয়েরই খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

দুর্গা একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া শাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, নিজেও একটা পরিল ; পরে ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া মুখ নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্চে ? বাঃ বেশ হয়েচে—চল্ মাকে দেখাইগে।

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল্ না, খুলে ফেলিস্‌নে যেন, বেশ হয়েচে !

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায়

নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এদিকে ভাখো মা—অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ওমা! ও আবার কে রে? কে চিনতে তো পারচি নে!

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল; বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে।

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগ্‌ডুগি বাজচে, চল্, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শিগগির আয়—আগে-আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে-পিছনে অপু ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া—বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা ও অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ি গিয়া মাথার রেকাবি নামাইতেই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে-করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজভাইয়ের বিধবা-স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন-মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেখানেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের জন্য খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন-পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে, সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে!

চিনিবাস রেকাবি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে টুনুদের বাড়ি।

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কি হ্যাংলা স্বভাব! নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না!

তা না লোকের দোর-দোর—যেমনি মা তেমনি ছা।

ইহাদের বাড়ির বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার? বাবার কাছ থেকে দেখিস্ রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো—আমি দুটো। তুই আমি মুড়কি কিনে খাবো।

খানিকটা পরে ভাবিয়া-ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের কতদিন আছে রে দিদি?

* * * * * * * * * *

চার ॥ দুগ্‌গাদিদি

* * * * * * * * * *

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সর্বজয়া একবাটি দুধে কিছু ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল।—দেখি হাঁ কর্—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর দুধ—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ, ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু, বাঁচবে কি খেয়ে? দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধূলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার-আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে; পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধূলা নাই। কোথায় কোন ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি

বাঁধিতেছে, কোন বাঁশতলার শেয়াকুল খাইতে মিষ্টি এ সব নখদর্পণে।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে? এসো ভাত তৈরি; খেয়ে আমায় উদ্ধার করো তারপর আবার কোনদিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে ছাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে—আর অতবড় ধাড়ি-মেয়ে—দিনরাত কেবল টো-টো, সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা ছুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এল বাড়ি, মাথাটার ছিরি ছাখ না? না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো। সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুয্যের বাড়ির সেজ-ঠাক্‌রুন, পিছনে-পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেবরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আরো চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ-ঠাক্‌রুন কোনো দিকে না চাহিয়া বা বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্‌-হন্‌ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের দেওর-পোর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর্‌ পুতুলের বাক্স, দেখি—এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বে টুনু ও সতু ছুজনে মিলিয়া ছুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর এক ছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া

বলিল—এই ছাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখো জেঠিমা আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে, এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি, কি খুড়ীমা! কি হয়েছে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই ছাখো না কি হয়েচে, কীর্তিখানা ছাখো না একবার। তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে ক'দিন থেকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম। ছাখো একবার কাণ্ড! তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর। আর ওই ছাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অভিযোগের অতর্কতায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্ এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কোনো উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা ছ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেন না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজ-খুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা, তা তো বলিনি। আমি ওকে জিগগেস করচি। সেজ-ঠাক্‌রুন হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিগগেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি। এই বয়সে যখন চুরি বিত্তে ধরেছে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল্ রে সতু, নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—

দলবল সহ সেজ-ঠাক্‌রুন দরজার বাহির হইয়া গেলেন।

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া, দুধ-ভাত-মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে-মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেচে, ম'লেও আপদ চুকে যায়। মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়! বেরো বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে-খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছার দু-এক গাছা, সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে-খাইতে অবাক হইয় সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কি না তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনো দিন দেখে নাই; কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয়, তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখী তলায় যে আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জরাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনক-ভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলা এভাবে লইয়া গেল—তাহার উপর আবার দিদি এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের একগাছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে, তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়, কেমন যেন মনে হয়—দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সমস্ত দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে, সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে

লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া-থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পটুলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি—একে-একে সকল বাড়ি খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই।

রাজকৃষ্ণ পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচো জেঠিমা? বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে-যাইতে ভাবিল—বাঁশবনের কোথাও যদি বসিয়া থাকে? সে দিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই! তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ি সব ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেছে—ও আমাদের দিকে হবে—আয় রে অপু। অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি আজ খেলবো না রাণুদি—দিদিকে দেখেচো? রাণু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি? বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেকদূর পর্যন্ত

জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই, যদি কোনোদিকে গাছ-পালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি!

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝট্‌পট্ করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাড়ির পথে ফিরিতে-ফিরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাবগাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাব-গাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে! কেন যে তাহার এই গাছটার নীচ দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আরেকটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটুলিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটুলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটুলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধুজেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সার তাগাদা করিতেছে। অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, ঠাক্‌মা—বকুলতলা থেকে আসতে আসতে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ি গেল! এই কতক্ষণ যাচ্ছে, ছুটে যা দিকি—বোধ হয় এখনো বাড়ি গিয়ে পৌঁছায়নি।

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটুলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি ঢেঁকশেলের পিছনে নিমতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস্—

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দুর্গা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে-করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়িয়া বাহির হইতেছে—পিছনে-পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে করিয়া মারিতে-মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও, বেরোও, একেবারে জন্মের মতো যাও, আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।···ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারি হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া-টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেই মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো।

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোনো জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথামতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে-ভয়ে প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ; কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা-মোটা ভারি ইংরাজি কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালী, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় কয়িয়াছে, এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার খুলিয়া দেখে। খানিকক্ষণ দেয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছে, এমন সময় সর্বজয়া একবাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এসো, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া লইয়া দুধ খাইতে লাগিল। অন্য দিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে মুখ হইতে বাটি নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে?

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল, সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু চুমুক দিতেছে না। তাহার বাটিশুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে। পরে অনেক ক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে ফুঁপাইয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হল রে? কি হয়েচে? জিব কামড়ে ফেলেছিস? অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন করচে মা! সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া, পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্ত সুরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না, অমন করে কাঁদে না। ঐ পটলাদের কি নেড়াদের বাড়ি বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ওপাড়ার পালিতদের বাগানে বসেছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি। কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছিঃ!

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, বাকি দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল।—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী, সোনা, উনি এলেই ডেকে আনবেন এখন। একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ…

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনো রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছে।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েছে?



দুর্গার মুখে কোনো কথা নাই। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার ওপর রাগ করিচিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে-আস্তে বলিল—না বৈকি? তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিল। না, সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে। কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম; তারপর বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল; আমি বললাম, ভাই তুমি দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে; সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে না রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি মেরেচে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনো কনকন কচ্ছে, এইখানে এই ছাখ্ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

—থাক্‌গে। কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাবো বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেচে! এই এত বড়—কাউকে বলিসনে। তুই আর আমি চুপি-চুপি যাবো—আমি আজ দুপুর বেলা দুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড়!

* * * * * * * * * *

পাঁচ ॥ নেবুর পাতায় করমচা

* * * * * * * * * *

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলা পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাড়ির বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল। অপুও দিদির পিছু-পিছু ছুটিল! দুর্গা ছুটিতে-ছুটিতে বলিল—শিগ্‌গির ছোট্, তুই বরং সিঁদুর-কৌটো তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো।

ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়-বড় গাছের ডাল ঝড়ে ঝাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে-গাছে সোঁ-সোঁ-বোঁ-বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানের শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওয়ালা শাদা-শাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চীৎকার করিতে-করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিকে ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি।…চীৎকার যতটা করিতে লাগিল, তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোররবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না ; যদি বা শোনা যায়, ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দ হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে পাইল দুটা। তাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ দিদি কত বড় দ্যাখ। ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সেতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু কুড়চ্ছে!

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এসেচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচ? পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়ুবে বই কি? ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না; কিন্তু সেদিন মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চলে। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলি তো? এখানকার চেয়েও বড়-বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়ুবো এখন—চলে আয়।

রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু-দা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন জায়গায় বড়-বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তেখাগী তলায়?···কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড়-বড় গাছ আছে—চল্।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌছানো যায়।

অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা-মোটা অনেক কালের পুরনো গুলঞ্চ-লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে; বড়-বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায়-পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নয়ই, তাহার উপর আবার ঝড়ো মেঘ এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভালো দেখা যায় না! তবুও খুঁজিতে-খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু, বিষ্টি এল।

সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল - এবং একটু পরেই মোটা-মোটা ফোঁটায় চড়বড়্ করিয়া চারিদিকের গাছের পাতায়-পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই, এখানে বিষ্টি পড়বে না। দেখিতে-দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যে নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বেশ বাড়িল। দুর্গা ও অপু যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না;



কিন্তু পুবে হাওয়ায় জলের ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি, বড্ড যে বিষ্টি এল!

—তুই আমার কাছে আয়···দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে! বিষ্টি হল ভালোই হল—আমরা আবার সোনামুখীতলায় যাবো এখন, কেমন তো? দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,
হে বিষ্টি ধরে যা—

কড়্—কড়্—কড়্—কড়াৎ···প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার

মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে? রাম-রাম বল্—রাম-রাম-রাম-রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা···

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাজ পড়িতেছে না কি? গাছের মাথায় বন-ধুঁদুলের ফল দুলিতেছে।

শীতে অপুর ঠক্‌ঠক্ করিয়া দাঁতে-দাঁত লাগিতেছিল। দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার-বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা···ভয়ে তাহারও স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া-জমিয়া-যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্‌ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুর-ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখিছিস্ ওদিকে? আশালতা বলিল—না খুড়ীমা,

দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে?···হাসিয়া বলিল—কি বেঙডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজন বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর ফেরেনি! এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্নমনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় খিড়কি দরজা ঠেলিয়া আপাদ-মস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে-আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে-পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তভাত হইচিস্? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়?··· ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি! পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথায় পেলি রে দুগ্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনে চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ্ চুপ্ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল; ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা?—ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে, আমাকেও বোধ হয় দেখেচে··পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে

আমি টের পাইনি, সোনামুখীর তলায় যদি আম পড়ে থাকে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু, বাগলোটা নে—মা'র ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু হাত নাড়িয়া খুশির সুরে বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট্।

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা! ছেঁচ্‌তলায় রেখে দে, জল দিয়ে নোবো। আয় সব কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব।

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুয্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়কি-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল, সেজঠাকরুন বাড়ির মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন···

—একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া—মাগনা তো নয়। তার ত্রেনোগাছটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার যো আছে! ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একবারে তুড়তুড় করে দৌড়?—এত শত্তুর্‌তা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যাক—এই ভর্ সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলে-

মেয়ের কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল, যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি! কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া 'সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যে-বাড়ি ঢুকিল না—ভয়ে-ভয়ে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁকে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে-আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই তাহলে কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তো ফেরত দেওয়া হল, তা কখনো লাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—তুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে। অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—এক্‌খুনি?

—হ্যাঁ, এক্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট্‌ করে যা। বলে আয় আমরা কুড়িয়া পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু একটু দাঁড়াবে না মা? বড্ড অন্ধকার হয়েছে, অপু, চল্‌ আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়তে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর ওদের

তুমি বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখো, ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো তুমি ওদের মুখের দিকে চেও, দোহাই ঠাকুর।

* * * * * * * * * *

ছয় ॥ গুরুমশায়

* * * * * * * * * *

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু ওঠ শিগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠ, মুখে ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মা'র কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ

ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে-বসে খেও এখন, ওঠ লক্ষ্মী মানিক!···মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ? ··পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল। খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ি আসচিনে দেখো!

—ষাট্-ষাট্ বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই ছিঃ—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্বে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো; তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার! কোনো ভয় নেই। ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিও, যেন ওকে কিছু না বলে।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটির সময় আমি আবার এসে তোকে বাড়ি নিয়ে যাবো অপু। বসে-বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন। ···খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

পরে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব-লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়-বড় ছেলে আপন-আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক ছুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাত্‌তাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নিচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপি-চুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম ; অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা—সঙ্গে-সঙ্গে তাহার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল, ও মাঝে-মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

অপু নিজের শ্লেটে বড়-বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফণে, শেলেটে ওসব কি হচ্ছে রে ?·· সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল ; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত। তিনি বলিলেন, এই সতে, ফণের শেলেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ এসব কি খেলা হচ্ছে শেলেটে ? সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে। কানে ধরে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে-পায়ে গুরু-মহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল ; সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক-ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুমহাশয় বলিলেন—হাসে কে রে ? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা ? অ্যাঁ এটা নাট্যশালা নাকি ?



নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে এসো তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল। কিন্তু ইট আনা হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপ তুলিয়া বসিয়া-বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে-মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের

সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেউ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক-একদিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্ন্যাল মহাশয় দেশ-ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ! তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন; মনে হইতেছে সান্ন্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশি আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জন-প্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কী? সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ-ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক দিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক্ শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া সান্ন্যাল মহাশয় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন

ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে-কাটিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচো যে! ক'টা মাছি পড়লো?

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্ন্যাল মহাশয় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেখানে হাতখানেক জমি উৎসাহে সে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত—যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত!

এক-একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রী কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মহাশয় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে

খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা, কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল! পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখান হইতে লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে! রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি? সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের উপর। জোয়ান বয়সেও আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না! একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাক্‌দা থেকে গঙ্গাচান করে গরুর গাড়ি করে ফিরচি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি—গাড়িতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকেষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁখানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হল কি জানো? জন চারেক ষণ্ডামার্কা



গোছের মিশ্‌ কালো লোক এসে গাড়ির পিছন দিকের বাঁশ দু'দিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি; এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্‌-পিট্‌ করে পিছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিলে। তারাও বেশ এগিয়ে যাচ্চে। এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল, বাজার দেখা যাচ্চে; তখন সেই লোক ক'জন বললে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে



পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বললে—সে হবে না ব্যাটারা ; আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বললে—আচ্ছা, যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিস্‌নি! তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা! মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অমনি ধরেই রয়েচে আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেচে গাড়ির সঙ্গে ; একেবারে পেরেক আঁটা হয়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা···

গল্প বলিতে-বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বন-

জঙ্গলে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত! কাঁঠাল গাছের, জগডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে তালপাতার চাটাই, ছেড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া—সবশুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজি মাটি দিয়া কাচা, সেলাই-করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে। তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম, চিক্কণ, সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে; তাহার ডাগর-ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়। এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি—তাহার শিশুমন থৈ পায় না!

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন, ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল, তুমি বরাবর সোজা যদি

ওপথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে। বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে, কত মোহর-ভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বন-ঝোপের নিচে, কচু ওল বন-কলমীর চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায় !

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল। সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল 'শিশু-বোধক'। এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—দেখি, শেলেট নাও, শ্রুতিলিখন লেখ।

মুখে-মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের বলিতেছেন না—মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী হইতে ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে-শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলা অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর-পর সে কখনো শোনে নাই। সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না; কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এই অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন

হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার-বার উঁকি মারিতে লাগিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলে-বেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়··· পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া···' ইত্যাদি।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে —তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়। সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দুধারে যে কত কি অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা,অচেনা বনঝোপ—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল— ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধব-পুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে। ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক

দূরে গিয়াছে—রামায়ণ, মহাভারতের দেশে। সেই অশ্বত্থ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে তাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা!

শ্রুতিলিখন শুনিতে-শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ওই পথের ওধারে—অনেক দূরে—কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি? বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কত দূরে সেই প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে...

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

* * * * * * * * * *

সাত ॥ আতুরী ডাইনি

* * * * * * * * * *

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্রমাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু? চাল-ভাজা আর ছোলা-ভাজা ভাজচি—বেরুস না যেন! এক্ষুনি খাবি।

অপু শুনিয়াও শুনিল না। যদিও সে চাল-ছোলা-ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা

সে জানে ; তবুও সে কি করিতে পারে? এতক্ষণ কি খেলাটাই না চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি? ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম-গরম খাবি, আমি ঘাট থেকে তাড়াতাড়ি এসে ভাজতে লাগলাম! ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই; তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ি চল নীলুদা, আমার মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ি চল।

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনো কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে; এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান

দিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কিরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে; উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একপাশে একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল। আতুরী ডাইনির বাড়ি! সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে, ওই উঠানের গাছ হইতে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুপাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়? কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে—আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে-শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্তিরে তুই

ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে—তুই সেই কুচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্‌ দিকি!

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা, এবং চাহিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল! বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনিই তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না!

আতুরী বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া, ভালো করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে-পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল!

অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই। যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা যেন তাহার উপরই বেশি—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া বোধ হয় কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে আজ মায়ের মনে যে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার ফল এইবার ফলিতে চলিল! সে

অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে, ও বুড়িপিসি, আমি আর কিছু করবো না। আমাকে ছেড়ে দাও; আমি ইদিকে আর কক্ষনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও, ও বুড়িপিসি!

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা! মোরে ভয় কি? পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল—মুই কি ধরে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দেবানি, এস।

আমচুর!···ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি···! ডাইনিরা রাক্ষুসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এরকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে করে কি!·· উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে-আসিতে বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিতে আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পুরিল বলিয়া! সে আড়ষ্টকণ্ঠে দিশাহারাভাবে বলিয়া উঠিল—ও বুড়িপিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ

আর কিছু বোলো না। আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া পাড়তে আসিনি—আমার মা কাঁদবে।

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ি, ঘর, দোর, গাছ-পালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া! কেহ কোনো দিকে নাই—কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রুর-দৃষ্টি-মাখানো একজোড়া চোখ, আর বহুদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক!

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল। নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে-পিছনে।

ইহাদের এত ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?···

* * * * * * * * * *

আট ॥ রেলের পথ

* * * * * * * * * *

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা পাবে—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার, বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে-মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গণিতে-গণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাড়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল্ না! আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি? কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল্ গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধ হয় যাওয়া যাবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসবো কি করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো, এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়, খানিক দূরে গিয়া

একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা ; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধান-ক্ষেত-জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া-টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল, তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা-রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। শাদা-শাদা লোহার

খুঁটির উপর যেন এক সঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা ; যতদূর দেখা যায় ঐ শাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে। তাহার বাবা বলিল—ঐ ছাখো খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন?···উহার উপর দিয়া রেল গাড়ি যায়?·· কেন?···মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন?··পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন?···ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ-সোঁ কিসের শব্দ?·তারে খবর যাইতেছে?··কাহারা খবর দিতেছে?··কি করিয়া খবর দেয়?··ওদিকে কি ইষ্টিশান?·· এদিকে কি ইষ্টিশান?—কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেল গাড়ি কখন আসবে? আমি রেল গাড়ি দেখবো বাবা।

—রেল গাড়ি এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুরের সময় রেল গাড়ি আসবে, এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কক্‌খনো দেখিনি, হ্যাঁ বাবা?

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে! চল, আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন; বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সে বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা সমাদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুর ঘাটে আসিয়াছিল; জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল—পুকুর-পাড়ের বাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলা-বাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে কি বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেচ খোকা? অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা। প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে, সে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ি।

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি? তুমি বট্‌ঠাকুরের গুরু-মশায়ের ছেলে বুঝি? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক; লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে অতি সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে

ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস! তাহাদের বাড়িতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রঙ-বেরঙের ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি! দু-একটা জিনিস সে ভয়ে-ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল!

এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বধূটির মনে হইল যে, এ এখনো ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ-বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর, অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই; এমন রঙ, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর-ডাগর নিষ্পাপ চোখ! অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। একটি বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ—এত ঘি-দেওয়া যে আঙুলে ঘি মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর কখনো সে খায় নাই তো! মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিসও থাকে না, ঘি ও থাকে না!··· বাড়িতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে

মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা, ওবেলা তোকে করে দেবো। পরে সে শুধু সুজি কাঠখোলায় ভাজিয়া, জলে-সিদ্ধ করিয়া ও গুড় মিশাইয়া, একটি পুল্‌টিসের মতো দ্রব্য তৈয়ার করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে। মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ তাহার মনে হইল—এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত!··সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মা জানে না যে, এইভাবে মোহনভোগ তৈয়ারি করিতে হয়! সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব, তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় না···

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ-প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা সেই বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া, জল ছিটাইয়া, অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা; বেশ টকটকে ফর্সা রঙ, বড়-বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পর অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল।

সেদিন বৈকালে খেলিতে-খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া—আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল। অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে সাবধানে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই হয়তো কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া, গোলার পাশ হইতে পাথরখুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার কাছে বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের-পাখি, শোলার গাছ—আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা থেকে সেসব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। কত নতুন-নতুন খেলার জিনিস! একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে চাও তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্‌ করিবে। একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া দুহাতে খঞ্জনি বাজাইতে থাকে। সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐ রকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্‌ করিয়া মেজের উপর চলিতে থাকে; অনেকদূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া!



সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম্ ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রঙের একখানা ছোট রাংতার মতো কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন? সোনার পাত দেখোনি? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রঙ কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার এ সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বীচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়! তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেলনার ঐশ্বর্য যে কত বেশি, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি গভীর করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত, আর একটা রবারের বাঁদর—তুমি যেদিকে তাকাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করিত!

বধুর কাছে একজোড়া পুরনো তাশ ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা জোড়া তাশের পরিত্যক্ত কাগজগুলি

এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র, অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে-চাড়ে। রাণুদির বাড়িতে মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা তাশের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া-বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া প্রায়ই মারামারি হয়—বেশ খেলা!

সে তাশ খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-একদিন তাহার মা তাশ খেলিতে যায়; তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না। সকলে বলে—ও কিচ্ছু খেলা জানে না।

সে যদি একজোড়া তাশ পায়, তবে সে, মা আর দিদি খেলে।

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। খুব ছোট্ট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও লেবু কেন? নুন-লেবু তো মা পাতেই দেয়। প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা-আলাদা বাটি!—উঃ, তরকারিই বা কত!

অত বড় গল্‌দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য? লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশে নীল বেলা আবছায়া দেখা যায়।...

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই তো মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন ভালো রকম জমে নাই। অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনা খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছি-মিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্‌খনো তার সঙ্গে ঝগড়া করব না, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক!··বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! ···রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকার রেলগাড়ি যায়। মাটির আতা, পেঁপে, শশা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে শুরু করে। তারপর অমলা-দি। কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুল ভরা বিল—কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া। সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারে কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ-চিঁড়ে-বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোনটা

ফেলিয়া সে কোনটার গল্প করে? রেল-রাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার-বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল? না—রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেল রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত, কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে-সঙ্গে কি একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল ও দুইদিক হইতে দুটো কাঠির মতো কি উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল—কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পক্ষণ পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে? আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনো মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়! কক্‌খনো

আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া-বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টস্বরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেটে নিয়ে আসিনি ?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস ? কি হয়েছে ?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না ? কাঁটায় আমার হাত-পা ছড়ে যায়নি বুঝি ?

—কি বলে পাগলের মতো ? হয়েচে কি ?

—কি হয়েচে ? আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না ?

—তুমি যত উদ্‌ভুট্‌টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু ! দেখিচি কি পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েছে—টেলিগিরাপ কি ফেলিগিরাপ ? আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো ?

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ, কি ভীষণ হৃদয়হীনতা। আগে-আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে, অবশ্য যদিও তাহার ভ্রান্ত ধারণা অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর, পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই ! কাল সারাদিন

কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আম-বাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহুকষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল—এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে—সব ঠিকঠাক, আর কি না···ওঃ···

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল ; এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়ে তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না, যাও—ককৃখনো খাবো না। তাহার মা বলিল—না-খাবি না-খাবি যা, ভাত খেয়ে একেবারের রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না। না খাবি যা, দেখবো খিদে পেলে কে খেতে ছ্যায়? বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত-স্বরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু কোথায় যাচ্ছিস অমন করে, কি হয়েচে? ও অপু, শোন্—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যতসব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল! কী এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেছে, আসছি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি

হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না। না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়। সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস-নয়নে ওপাড়ার পথে রায়দের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপু:দের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত, তবে সে কখনোই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আবার তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেল রাস্তার তার!

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ির উঠোনে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম! দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল।

সতু বলিল—তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পারবো না। অপু মনে-মনে বুঝিল বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া

খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশমুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি, আমি আর দিদি খেলবো এখন। পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবি নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল। —যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও সতুদার মন ভিজিল না।...

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইঁট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বন-জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে। দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলুর ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব-লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিল; আনিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল।

অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভালো বালি আছে, মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে; সেই বালি চল্ আনিগে—শাদা চকচক কচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি!

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে-খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন-চট্‌কা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়-বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নিচের দিকের লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন তাহার নজরে পড়ে।···

পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, ছাখো না, কি রকম দোকান হয়েছে। কেমন ফল এই ছাখো; আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম। কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল-ফল, আমাদের বাগানে কত ছিল! সতু আসতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড় একটা আসে না। তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলায় ছেলেমানুষিটুকু যেন কতকটা ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই, আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে।

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি? তোমরা তো হলে কনেযাত্রী—সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাবো। সতুদা, রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন চন্দন বেটে রাখে, কাল সকালে নিয়ে আসবো—

দুর্গার কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি যেন তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল; সঙ্গে-সঙ্গে অপুও —ওরে দিদিরে, নিয়ে গেলরে—বলিয়া, তাহার রিনরিনে গলায় চীৎকার করিতে-করিতে সতুর পিছনে-পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে-সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল-ফল তিনটির একটিও নাই!

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল—সতু গাবতলার পথে আগে-আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু-পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন-চার বৎসরের বেশি; তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা শক্ত। তাহার

সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে, তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে, সতু গতিবেগ কমাইয়া একবারটি নিচু হইয়া যেন পিছন ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে-সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। পরক্ষণে সতু ছুটিয়া চাল্‌তে-তলার পথে পড়িয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিয়াছে। অপু একটু সামনের দিকে নিচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে। দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দুহাত দিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি; চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্‌-সর্‌ দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াস্‌নে; একটু তাকা দেখি। অপু তখনি দুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু দিদি, চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—চাইতে পাচ্ছিনে আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি।

—দেখি-দেখি, ওরকম করে চোখ রগড়াস্‌নে—সর্‌ পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল। দুর্গা তাহার দুই চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ

দেখতে পাচ্ছিস্ তো? আচ্ছা, তুই এখন বাড়ি যা, আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি—রাণুকেও বলবো। আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো! তুই যা, আমি আসচি এক্‌খুনি।

রাণুদের খিড়কির দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজ-ঠাক্‌রুনকে সে ভয় করে, খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল—অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; অত সাধের ফলগুলি গেল, তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ জব্দ করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল, সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস্ নে অপু। আয়, তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়। চোখে কি আরো ব্যথা বাড়চে? দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্?···

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠাবাড়ির

পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রঙের সেকালের বেতের পেঁটরা, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘর ভরা। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরনো জিনিসের কেমন একটা পুরনো-পুরনো গন্ধ বাহির হয়। সেটা ঠিক কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু তাহা যেন বহু অতীতকালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সেই অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ কাঠের বড় সিন্দুকটা ছিল! ওই যেখানে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলে-মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়, তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া, দিনের আলোয় পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, সেগুলি তাহার ঠাকুর-

দাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের; তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নিচে নামাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারের জানলাটায় বসিয়া সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে। সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় —অনেকটা বুঝিতেও পারে।

পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। তাহার বাবা মাঝে-মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়। রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে—পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো।

বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন। দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়েস হবে, দু-তিন খানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে, বিশ্বাস করবে না, এখনো ভালো করে অক্ষর চিনলে না! বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। ঐ যে ক'দিন আমি আছি রে বাপু, তারপর চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠি ধরতে হবে।

পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে? করলে তো চিরকাল সুদের কারবার! হলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে! বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেননি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?···

তাহাদের ঘরের জানলার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানলায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে-ওগাছে দোদুল্যমান কতরকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটুওলের সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বন-জঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ-বন অফুরন্ত ঠেকে। সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ-বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই! শুধু এই রকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো, থোলো-থোলো বন-চালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের-ওগাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে-চলিতে কোথায় কোনদিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে; শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরনো পুকুর আছে, তারই পারে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা। এক সময় কি বিষয়ে সফল-মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন; তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে, তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনো ফিরিবেন না। সে অনেক কালের কথা। বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই?

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন্‌গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন, সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টস্বরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে

অল্পদিনের মধ্যে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে। বলে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দ তলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজো করে।…কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারে শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেল।…এই ঘটনার দিনকয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার অপু শুনিয়াছে! জানলার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে উঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—হঠাৎ সেই সময় যেন—



খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ি পরনে, হাঁতে-গলায় মা-তুর্গার মতো ঝকমক করিতেছে হার আর বালা।

—তুমি কে ?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভালো ছেলে, কি বর চাও ? ··

তুপুরবেলা কোনো-কোনো দিন সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক-একবার ঝিরঝির হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত-মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে। কোনো বটগাছের মাথার উপর হইতে গাঙ-চিল টানিয়া-টানিয়া ডাকে—

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না; ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নেই। জানলার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা! নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর; গুলঞ্চলতার তাঁর টাঙানো—খেজুর ডালের ঝাঁপ। বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়, রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবু গাছের মাথায় চিকচিক করে, চকচকে বাদামী রঙের ডানাওয়ালা তেড়ো-পাখি বনকলমী-ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে। তাজা মাটির গন্ধ—ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া উঠে। কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে কি সে আনন্দ ?···

* * * * * * * * * *

নয় ॥ শকুনির ডিম

* * * * * * * * * *

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। কয়েকস্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়াই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়ি-খেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলে-পাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণ-পাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে-পাড়ায় বাড়ি, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোট ; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—ক'টা কড়ি ? পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সুতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল—সতেরোটা এনেচি—সাতটা সোনা-গেঁটে ; হেরে গেলে আরও আনবো। পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসি-মুখে কহিল—কেমন দেখেছিস ? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে। খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে ;

সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু, উপর হইতে টুক করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার-বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতের টিপ বেশি।

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু' ভাবিল—এত বেশি কড়ি আমি কোনোদিন জিতিনি; আজ আর খেলচিনে—খেললে কি এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ বেশি! সব হেরে যাব।···হঠাৎ সে ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশি নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ি যাচ্ছি···পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি? …সঙ্গে-সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষণ্ণমুখে বলিল—বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত!…পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল। সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটা অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু যে খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—দিদিকেও না

সেদিন সে দুপুর বেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি-চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা বইয়ের মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বা বইখানা কোন বিষয়ের—তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নিচ হইতে বাহির হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে নিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরনো-পুরনো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু-পুরু পাঁতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভালো লাগে; গন্ধটায় কেবলই তাহার বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়।

অত্যন্ত পুরনো মার্বেল কাগজের বাঁধাই মলাট—নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এইরকম পুরনো বইয়ের উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে-পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল

বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে-করিতে লেখক লিখিয়াছেন—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া, মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারে!

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, আবার পড়িল—আবার পড়িল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি? তাহার দিদি বলিতে পারে না।

সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীপু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে—সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়!··তাহার মা বকে—এই ঠিক দুপুর-বেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস!···অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে ও বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরনো-পুরনো গন্ধটা। এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো অবিশ্বাস থাকে না। পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে; একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা সে যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কি করিয়া পায়?

সন্ধান অবশেষে মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠাল-তলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে-মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেবো। দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রঙের ছোট-ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই ভাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল—শকুনির ডিম।—ঠিক তো? রাখাল সে-সম্বন্ধে ভূরি-ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু দুইটি দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল—দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি কড়ি সব। এই এত বড়-বড় সোনাগেটে—দেখ্‌বি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজী হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া আর দুইটা পয়সা যোগাড় করিয়া দাম চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলো অপুর প্রাণ, অর্ধেক-রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা!

ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার প্রাণটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তারপর যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার আগে একা-একা নেড়াদের আমগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—সত্যি-সত্যি উড়া যাইবে তো! আচ্ছা সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ-পাখি ময়না-পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারা যেখানে উঠিয়াছে ওখানে?···



সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতা পাকাইবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে-হাতড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না—দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা, কিসের দুটো বড়-বড় ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে! দেখেচো কি পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সমস্ত দিন খাইল না। রুদ্রমূর্তি, কান্নাকাটি—হৈ-হৈ কাণ্ড।...

তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড! ওমা, এমন কোথাও তো কখনো শুনিনি! শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে? ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা—তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নাও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা, সে আর কি বলবো! কি করি যে এ-ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!

* * * * * * * * * * *

দশ ॥ মুচুকুন্দচাঁপা

* * * * * * * * * * *

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। এই গৌরবর্ণ, সদানন্দ বৃদ্ধটি সামান্য একখানি খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালোবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন; অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে-মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত; সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে-মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়—দাদু

আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো-বসো।

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কিন্তু এই সরল বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে। বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ—খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো। নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন; এক স্বজাতীয়া বৈষ্ণবের মেয়ে দুইবেলা কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া-বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়। কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ। এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে-করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা ধমক দিয়া 'জ্যাঠা-ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমিই আমার বালক-গোরা! তোমায় দেখলে আমার মনে হয়, দাদু, আমার গৌরচন্দ্র তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ, সরল ছিলেন; ওই রকম দিব্য ভাব-মাখানো চোখ-দুটি ছিল তাঁরও!

অন্যস্থানে এ-কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত; এখানে সে

হাসিয়া বলে—দাদু, তা হলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে-পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দুখানি; দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন—আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু। জানি তোমার হাতে এ বইয়ের অপমান হবে না।···

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, বিচিত্র পাখি ও গাছপালার সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে। দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাই তাহার এত প্রবল!

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে তাহাকে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টাখানেকের বেশি কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যেন হইয়া গেল। পরে ছুটি পাইয়া যে খাইতে যায়। খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে—আর অমনি সে আজিকার দিনে সকল খেলাধূলা, সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে

ভরপুর হইয়া উঠে ; বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।···

* * * * * * * * * *

এগারো ॥ চড়ুইভাতি

* * * * * * * * * *

একদিন চুপিচুপি দুর্গা বলিল – চড়ুইভাতি করবি অপু ?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বনভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মা-ও যায়, কিন্তু আজকাল তাহাকে আর লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের-নিজের জিনিসপত্র। অত উপকরণ তাহাদের নাই। বন-ভোজনে গিয়া আর সকলে বাহির করে কত কি জিনিস—ভালো চাল, ডাল, আলু, ঘি, দুধ। তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের ডালবাটা, আর দুই-একটা বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যেদের সেজ-ঠাকরুনের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায় ; নিজের ছেলেমেয়ের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে। তাহার অপু ঐরকম দুধ-কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে বড় ভালোবাসে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওপারে খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ্‌ তেঁতুলতলায় মা আসচে কিনা, আমি চাল-ডাল বের করে নিয়ে আসি শিগগির করে।

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি-চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে তুলিয়া লইল। মাল-মশলা বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া দিয়া বলিল—শিগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু! সেইখেনে রেখে আয়, দেখিস্ যেন গরু-টরুতে খেয়ে না ফেলে।

চারিদিক বনে ঘেরা; বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই ছ্যাখ্ অপু, কত বড়-বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটুদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো।

অপু মহা-উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনো বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না, খেলা-ঘরের বন-ভোজন—যা কতবার হইয়াছে—সেই রকম—ধূলার ভাত, খাপরার আলু-ভাজা, কাঁটাল-পাতার লুচি।

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি। বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে-ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে; বাতাবি লেবু গাছটায় কয় দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা-থোপা শাদা-শাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন, নিয়ে আয় তো

ডেকে, অপু। একটু পরে অপুর পিছনে-পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল; একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুগ্‌গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি—বোস্‌।

বিনি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে। পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু-সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত শাদাসিধা। যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বাস করে। অবস্থাও ভালো নয়।

বিনি সানন্দে দুর্গার ফরমাইস খাটিতে লাগিল। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুখনো কাঠ ছ্যাখ্‌ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভালো।

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি, না আরো আনবো?

দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে, ও-ও তো এখানে খাবে, আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু। বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি-কি তরকারি দুগ্‌গা দিদি? দুর্গা ভাত নামাইয়া, তেলটুকু দিয়া তাহাতে বেগুন ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার

দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন-ভাজার মতো রঙ হচ্চে, দেখিচিস্ অপু? ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এখনো যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন ভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন।

লবণকে ইহারা ভুলক্রমে একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাতৃপ্তিতে তিনজনে কোষো আলুর ফল-ভাতে ও পানসে আধ-পোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল! দুর্গার এই প্রথম রান্না—প্রথম এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা লতা-পাতার রাশের মধ্যে খেজুর-তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর-পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারি খাওয়া!

খাইতে-খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি-হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন!

বিনি খাইতে-খাইতে ভয়ে-ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে

তুগ্‌গাদি ? মেটে আলুর ফল-ভাতে মেখে নিতাম। দুর্গা বলিল
—অপু ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল।

অপু বলিল—মাকে কি বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস খিদে পাবে এখন।

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গেলাশটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দাও তো অপু! জল তেষ্টা পেয়েছে।

অপু বলিল—নাও না বিনি-দি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না! তবু যেন বিনির সাহস হয় না! দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাশটা নিয়ে খা না!

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে, দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বন-ভোজন করবো, কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দিই?

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি।

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে হাঁড়িটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

* * * * * * * * * *

বারো ॥ সোনার কৌটো

* * * * * * * * * *

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ি রাণুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এখনো কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলে-মেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম টুনি। সন্ধ্যার একটু আগে সেজ-ঠাক্‌রুন এঘরে কি কাজ করিতেছেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ-ঠাক্‌রুন দালানে আসিয়া-বলিলেন—কি রে হাসি, কি? টুনির মা উত্তেজিতভবে ও ব্যস্তভাবে বিছানা-পত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুর-কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল—আর তুলতে মনে নেই; কোথায় গেল আর তো পাচ্ছিনে! সেজ-ঠাক্‌রুন বলিলেন—ওমা, সে কি? হাতে করে ও-ঘরে নিয়ে যাসনি তো?

—না সেজদি, এইখানে রেখে গেলুম! বেশ মনে আছে; ঠিক এইখানে।

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করিল—কৌটার সন্ধান নাই। সেজ-ঠাক্‌রুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছিল, তারপর খাবার

খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ-ঠাক্‌রুনের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি-চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম, তখন দেখি যে দুগ্‌গাদি খিড়কি-দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেচে।

সেজ-ঠাক্‌রুন চুপি-চুপি কি পরামর্শ করিলেন; পরে রুক্ষস্বরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেছিস্‌ বল্‌—বার কর্‌ এখ্‌খুনি বল্‌চি; নইলে—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ-ঠাক্‌রুনের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিভ যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। সে অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই; একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। বিশেষত দুর্গাকে সে কয়দিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ—কথাবার্তা ভালো বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে; সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? টুনির মা বলিল—ও নেয়নি বোধ হয় সেজদি, ও কেন—

সেজ-ঠাক্‌রুন বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না। তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে? আমি জানি ভালো করে। একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে না, নয়তো কোথায় আছে বল্‌—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি—কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল ; তাহার পা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—সত্যি বলচি।

সেজ-ঠাক্‌রুন বলিলেন—বললেই আমি শুনবো ? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভালো কথা বলচি কোথায় রেখেছিস দিয়ে দে। জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বোলবো না—আমার জিনিস পেলেই হল।

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে—কোথাও শুনিনি তো কখনো। এ পাড়াতেই বাড়ি নাকি ?

সেজ-ঠাক্‌রুন বলিলেন—তুমি ভালো কথার কেউ নও, না ? দেখবে তুমি মজাটা একবার ? তুমি আমার বাড়ির জিনিস নিয়ে হজম কত্তে গিয়েচ—একি যা তা পেয়েচ বুঝি ? তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন—দুর্গা, বল্‌ এখনো কোথায় রেখেচিস্‌ ?···বলবি নে ?···না, তুমি জানো না, তুমি কচি খুকি—তুমি কিচ্ছু জানো না। শিগগির বল্‌, নৈলে নোড়া দিয়ে দাঁতের পাটি সব ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবো এখুনি। বল্‌, শিগগির—বল্‌ এখনো বলচি।

টুনির মা ছাড়াইয়া দিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন বলিলেন—রোসো না, দেখচো না ও-ই নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও, এখুনি মিটে গেল। আর কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতিকষ্টে শুকনো জিভে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চলে গেলে আমিও তো···ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া সেজ-ঠাক্‌রুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে থাকিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর!

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো ওর জ্বালায় তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা!

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ-ঠাক্‌রুনের কোনো লুকানো ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবেরে পাজি, নচ্ছার, চোরের ধাড়ি, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দাও কি না দাও!···কথা শেষ করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।···বল্, কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল্, শিগগির বল্।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ-ঠাক্‌রুনকে হাত ধরিয়া বলিল—করেন কি, করেন কি সেজদি! থাকগে আমার কৌটো, ওরকম করে মারেন কেন? ছেড়ে দিন, থাক হয়েচে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ রক্ত পড়চে যে!

দুর্গার নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে আগে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন—শিগগির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি, রোয়াকের বালতিতে আছে ছাখ।

চেঁচামেচি ও হৈ-চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারদের ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কামার বাড়ি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছিল, সে দিশেহারাভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল। জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল, সে মোহগ্রস্তের মতো বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন করে কি মারে সেজদি? আহা, রোগা মেয়েটা—ছিঃ।

—তোমরা ওকে চেনোনি এখনো! চোরের মার ছাড়া ওষুদ নেই—এই বলে দিলুম। মারের এখনো হয়েচে কি, জিনিস না পাওয়া গেলে, অমনি ছাড়বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর।

রাণুর মা বলিলেন—খুব হয়েচে, এখন একটু সামলাতে দাও সেজদি। যে কাণ্ড করেচো।

টুনির মা বলিল—ওমা, এত কাণ্ড হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলতো? বাবা, চাইনে আমার কৌটো, ওকে তুমি ছেড়ে দাও সেজদি।

সেজ-ঠাক্‌রুন এত সহজে ছাড়িতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কির উঠানে বাহির করিয়া দিলেন; বলিলেন—ভালো ক্ষণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে-আস্তে যা; টেঁপি খিড়কিটা ভালো করে খুলে দে।

* * * * * * * * * * *

তেরো ॥ হলুদ বনে বনে

* * * * * * * * * * *

গ্রামের বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি-বাড়ি চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন।

হরিহর বলিল—না খুড়ো, এবার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যায্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা?

বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজার দল। এরকম দলটি এ-অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি।

চড়কের আর বেশি দেরি নাই। বাড়ি-বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসীরা নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-

নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে-পিছনে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্যান্য গৃহস্থের বাড়ি হইতে পুরনো কাপড়, সিধা, পয়সা দেয়—কেউবা ঘড়া দেয়; তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া। এজন্য তাহাদের বাড়িতে এ-দল কোনো বারই আসে না! দশ-বারো দিন সন্ন্যাসী নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল। নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে। দুর্গা আসিয়া খবর দিল—প্রতি বৎসরের যে গাছটাতে কাঁটা-ভাঙা হয়, এবার সেটাতে হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে! পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে; চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণু, পুঁটি, টুনু। এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো-টো করিয়া যেখানে-সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতিকষ্টে বলিয়া-কহিয়া ইহারা নীলুর সঙ্গে চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্তিরে সন্ন্যাসীরা শ্মশান জাগাতে যাবে।

রাণু বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মরা

হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে! তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে, ছড়া বলতে-বলতে আসবে ; ওর সব মন্তর আছে।

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুনবি বলব ?

স্বগ্গো থেকে এলো রথ, নামলো খেতু-তলে।
চব্বিশ-কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে॥
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি।
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে ছ্যাও কাঠি॥

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা! দাসু কুমোরের বাড়ি দেখে এলুম। দেখিসনি রাণু ?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ডু রাণুদি ?

—নয়তো কি ? অনেক রাত্তিরে আসিস তো দেখতে পাবি।

—চল্ ভাই আমরা বাড়ি যাই—আজ রাতটা ভাল নয়। আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি ? কি হবে আজ রাতে ?

রাণু বলিল—সে সব কথা বলতে নেই, তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল ; সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে জন প্রাণী নাই। সন্ধ্যা হইতে শ্মশান ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন

ভয়-ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটু গন্ধ বহিয়া যাইতেছে! সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল; আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া চলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুমা?

বুড়ি বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা? তারই গন্ধ আর কি!

অপু বলিল—কারা ঠাকুমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নেই। রাম-রাম—রাম-রাম!

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অপ্রিয় অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল —আমি কি করে বাড়ি যাবো ঠাকুমা?

বুড়ি বকিয়া উঠিল—তা এত রাত্তির করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে? এসো আমার সঙ্গে! নীলপুজোর থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক।··

বারোয়ারি-তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া

সামিয়ানা ঠাঙানো হইয়াছে। যাত্রাদল এই-আসে এই-আসে করিয়া এখনো পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে লোকে বলে—কাল সকালের গাড়িতে আসিবে; সকাল চলিয়া গেলে সকলে বৈকালের আশায় থাকে! অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করে—এপাশ-ওপাশ করে।···যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

দুর্গা চুপি-চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল-নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপুর মনে হয়, যে পঞ্চানন-তলায় সে দুবেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মতো একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না। হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বৈকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!

কুমোর-পাড়ার মোড়ে দুপুর হইতেই ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, সন্ধ্যার একটু আগে দূরে একখানা গরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স-বোঝাই গাড়ি—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা! পটু একে-একে আঙুল দিয়া গণিয়া খুশির সুরে বলে—অপু-দা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি?

সাজের গাড়িগুলোর পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে; সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রঙ একেবারে বদলাইয়া গেল। অপু মহা-উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুনগুন করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে—যাত্রাদলের আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! উঃ, এ রকম দল আর—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই। বাবাকে সে নিতান্তই কৃপার পাত্র বিবেচনা করে। সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারি-তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে-বসে পড়বো? এক্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো। যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজাবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে! তখন না-হয় যেও এখন! নিজে প্রায় সময়ে হরিহর আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখের

আড়াল করিতে মন চায় না। অভিমানে ক্ষোভে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্নাভরা গলায় আবার টানিয়া টানিয়া শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত ?

সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে—ওবেলা বসিবে। দুপুর বেলা অপু মায়ের কাছে গিয়া কাঁদো-কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গা ছেলেটাকে ছেড়ে! বচ্ছরকারের দিনটা—তোমার তো ন'মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তর্কলঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা ?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারি-তলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে ছুটিয়া বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ-সময় তাহাকে বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল্‌না আমিও দেখতে যাবো।

অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? মেয়েদের জায়গা চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখানে বসবে!

মা বলে—এখন থাক, ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, আমি তাদের সঙ্গে যাবো—ও আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারি-তলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু! সে কাছে আসিতে হাসি-হাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার

হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দুপয়সার মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি লিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস।

ইহার দিন সাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি-চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—লিচু খাবো। কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক লিচু পেড়েচে, দুঝুড়ি-ই।—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড়-বড়, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা! সতু কিনলে, সাধন কিনলে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরস মুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল; তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে দুটা পয়সা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা, একটা কাজ করতো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয়তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে মানুষ-সমান-উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখ হইতে ছেলেবেলায় শেখা একটা ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে
—সুখ নেইকো মনে।

* * * * * * * * * *

চোদ্দ ॥ রাজপুত্র অজয়

* * * * * * * * * *

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে।

পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কি সব সাজ! কি সব চেহারা!

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো? তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেছে? চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে-সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ-রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক-এক পা করিয়া থামেন, আর

এক-এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন—সত্যকার জগতে কোনো বনবাস-গমনোগ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সে্রূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজসেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে, মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা।

অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়। এমন তো সে কখনো দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানী! ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা—ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেহ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়; তারপর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে'—শুনিয়া অপু এতক্ষণ অপলক চোখে চাহিয়াছিল, আর থাকিতে পারে না—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।···

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার-খেলা কি ভীষণ!···যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুড়া হয়, নয়তো কোনো হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বুঝি বিঁধিয়া যায়! রব ওঠে—



ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে! কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল, সব বাঁচাইয়া চলে। ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরতের সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাবে খোকা? ··ঘুম! সর্বনাশ!···না, সে বাড়ি যাইবে না! বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খায়। পানের দোকানের কাছে কিসের অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ার বন্দ অবস্থায় সিগারেট কিনিয়া সোঁ-সোঁ টানিতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়! আবার আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইয়ে হাত দিয়া বলিল—এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা! রাজ-পুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার কোনো নিদর্শন দেখা গেল না, হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ, অত পয়সা নেই, ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে—আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরী-দা! আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুরই সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড়

ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়; একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে? অজয় একটু অবাক হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না! দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে-মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে! তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর। ঠিক সে যাহা চায় তাহাই! অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই? আমাকে একজনদের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ি খায় কে ভাই?

খুশিতে অপুর সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে; সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়িতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্ছে। তুমি কাল থেকে যেও আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো। ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে।

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে।

শেষরাত্রের দিকে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি ফেরে। পথে আসিতে-আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রা 'এক্‌টো' হইতেছে। দিদি জাগিয়া জিজ্ঞাসা করে—ও

অপু, কেমন যাত্রা শুনলি? অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহাখুশির সহিত সে বলে—অজয় যে সেজেছিল, মা, কাল থেকে সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে।

তাহার মা বলে—দুজন খাবে নাকি? দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে—তা না হয় একজন চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বলে—বল্ না কেমন যাত্রা রে অপু?

—এমন কক্‌খনো দেখিনি। কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যে মরে গেল। অপু তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালার সঙ্গীত শোনে। একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে; শেষরাত্রে ঘুমাইয়াছে, তা-ও তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমায় নাই। সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সূঁচ বিঁধে; চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান যেন তখনো বাজিতেছে—তখনো যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে!

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে-বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল—কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গ দেশের মহারানী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে—রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মন্দ মানায় নাই বটে, কিন্তু তাহার মনে-মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার

যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া; ঐ রকম রঙ, অমনি বড়-বড় চোখ, অমন সুন্দর চুল। দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে একজায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই; এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছর-খানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি-চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে'।

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল! সর্বজয়া বলিল —বিকেলে মুড়ি ভাজবো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন। যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল—ভাই, তোমার তো গলা বড় মিষ্টি, একটা গান গাও না? অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন

যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া! নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চলতির পথ হইতে কিছু দূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—'শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত'—দাশু রায়ের পাঁচালির গান, বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই। তা তুমি গান শেখ না কেন? আর একটা গান গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—'খেয়ার আশে বসেরে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে'। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভালো লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়া লইয়াছিল; বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে-মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গানটা শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে-কোনো দলে ঢুকলে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায়—এর ওপর যদি শেখো।

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে? দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হোক, আজ একজন খাস যাত্রা দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ-প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কী উত্তর করিবে ঠাহর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না ভাই। তাহার পর দুইজনে গলা মিলাইয়া সেই গানটা গাহিল।

অজয় অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ-দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে।

বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল-সকাল ফিরি। যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো; দেখো, কেমন একটা সুন্দর গান আছে! ··

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে-ঘাটে-মাঠে, গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে-বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে-চরাইতে যাত্রার পালার নতুন-শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া, যাহার যে-গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অপু আরও তিন-চারিটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রাদলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল—একটা গান গাহিতে হইবে।

সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভালো গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভালো করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল, এস না খোকা, দলে আসবে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চল, তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রাদলের কাজ করা যে মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সে-কথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল—আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী-টখী, কি বালকের পার্ট এই রকম; তারপর ভালো করে শিখলে --

অপু সখী সাজিতে চায় না; জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য।

দিন-পাঁচেক পরে যাত্রাদলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে, তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন-তখন আসিত যাইত, এই কয়দিন সে অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই

শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রা-দলে থাকে, কোথায় শোয়, কী খায়, কে কোথায় ছাখে, তাহা বলিবার কেহ নাই। যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভালো কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা না, তুমি মুখে বললে এই খুব হল, টাকা দিতে হবে না; তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে। তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

সকলে বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার-বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়। গাবতলার ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ। আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে করতে। অপুর আমার যদি—উঃ মাগো।

* * * * * * * * * *

পনেরো ॥ খয়ের-ভেজা কালি

* * * * * * * * * *

প্রথম-প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল, তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ-অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভালো চাকুরি দিবে। (কাহারা চাকুরি দেয় সে-সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষের মতো অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল! ঘরের পোকা-কাটা কপাট দিন-দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল। আগে যাওবা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবুও সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা-একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিকঠাক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া!···

কিন্তু হয় কৈ? হরিহর বাড়ি হইতে গিয়াছে প্রায় দুই-তিন-মাস। টাকাকড়ি খরচপত্রও অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশি; খায়-দায়—অসুখ হয়, দুদিন একটু ভালো থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে—

তোর হল কি দুগ্‌গা? আজ কি বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যেবেলাও তো জ্বর এসেছে! দুর্গা বলে—তা হোক মা, সে জ্বর বুঝি? একটু তো মোটে শীত করলো! তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—

তাহার মা বলে—অসুখ হয়ে তোর খাই-খাই বড্ড বেড়েছে। আজ আর কাল ভালো যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে—আজ খুব ভালো আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার; ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো।···একটু পরেই হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বুঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর আসিবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়।

সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হুহু করে। ভাবে—জ্বর-জ্বর ভেবে এরকম হচ্চে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি।

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে—বোস দিকি একটু আমার কাছে, গল্প করি।

গল্প ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে

আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়। আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়! বই-দপ্তরে ঘুর্ণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকালে সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে, তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠল? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো তখন তুমি।

অপু ভয়ে-ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলা খুলিয়া চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো।

পরে সে বসিয়া-বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের ভিজানো কালি চকচক করে—অপু মহা খুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে; ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কি চকচক করছে ছাখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দিই?

একদিন মা'র কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে—ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা-ড্যালা খয়ের রোজ দরকার। রেখে দে খয়ের!

ধরা পড়িয়া অপু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে—খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি? আমি বুঝি এমনি-এমনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এই সব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না? তাদের সের-সের খয়ের রোজ যোগান রয়েচে যে দোকানে!

অপু বসিয়া-বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া সে খাতা প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে—মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না-থাকা সত্ত্বেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা।

দপ্তরে একখানা বই আছে—বইখানার নাম 'চরিতমালা,' লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরনো বই। তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে; কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে-মাঝে খানিকটা খুলিয়া পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে, সে ঐরকম হইতে চায়।

* * * * * * * * * *

ষোলো ॥ বাঁশবাগানে মাছ

* * * * * * * * * *

বৃষ্টির বিরাম নাই একটু থামে, আবার এমনি জোরে আসে যে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া-ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছিল; তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খবর আসিবে। ছেলেকে বলে—তুই খেলে-খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে; ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাকবি, পিওন যেমন আসবে আর অমনি জিগগেস করবি।

অপু বলে—বা, আমি বুঝি বসে থাকিনে? কালও তো এলো পুঁটুদের চিঠি, জিগগেস করে এস পুঁটুকে? আমি থাকিনে বৈকি?

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে, অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চমকাইলে মনে-মনে ভাবে—দেবতা কি রকম নলপাচ্ছে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাকবে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে। বাড়িতে ফিরিয়া দেখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে-ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আনলে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত! হুঁ-উঃ! তোমার তো বসে-বসে বড়ো সুবিধে! ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে, এই এতটা—এক হাঁটু জল, যাও দিকি! ··

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবি বাহির করিয়া বলে—এই ছাখো জিনিসখানা খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুস-কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি, যাই নিয়ে—এ যে-সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দানের—এখন এ জিনিস আর মেলে না।

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি দিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে, সর্বজয়া এ অনুরোধ বার-বার করে।



দুই-একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পুবে হাওয়া—খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে-ঘাটে একহাঁটু জল ; দিনরাত সোঁ-সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে ; চার-পাঁচ দিন সমানভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা-বর্ষণ। অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে-মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেছে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল, না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে? অপু বলে—তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস, তেঁতুল-তলার পথে হাঁটু-জল। পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে? ঘরে একটা দানা নাই—দুটিখানি বাসী চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে—তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি? আমি দুটো ভাত খাবো—হুঁ-উ।

তার মা বলিল—লক্ষ্মী আমার, ওরকম কি করে। অনেক করে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন করে, উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে। পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই ছাখ একটা কইমাছ, বাঁশতলায় দেখি কানে হেঁটে বেড়াচ্চে ; বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজপোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই সব উঠে আসচে।

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া দেখে—অবাক হইয়া যায়। বলে—দেখি

মা মাছটা? হ্যাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?

অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কি করে এল? বাঃ, বেশ তো! মা কি আর ভাল করে খুঁজেচে? খুঁজলে আরও সেখানে পাওয়া যেত! দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে; কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে। চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘ ও ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার।

দুর্গা যে-বিছানায় শুইয়া আছে, তাহারই একপাশে তাহার মা ও অপু বসে।

ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। অপু হাসিয়া বলে—মা, কী সেই ছড়াটা? শামলঙ্কা বাট্না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ।

অপু বলে—দূর! হ্যাঁ মা তাই?—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে!

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো

বেঁধে। মনে-মনে ভাবে—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে! কি অদেষ্ট যে করে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে' পারিনে। ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনকিা!···আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হলে আর এ-দুঃখ থাকবে না। ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়; অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা, ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে।

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে। বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ, ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া-সরাইয়া পাতিয়া দেয়! দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দেখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপসপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা, ও দুর্গা, শুনছিস? একটু ওঠ দিকি, বিছানাটা সরিয়ে নি। ও দুর্গা, শিগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব!

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না! অন্ধকার রাত, এই ঘন বর্ষা। তাহার মন ছমছম করে, ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে—কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হল? কেন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক গে যাক! এরকম তো কোনোবার হয় না।·· তাঁর শরীরটা ভালো আছে তো?··মা সিদ্ধেশ্বরী, স'পাঁচ-আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা!

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাড়ির বাহির হইয়া দেখিল, বাঁশবনের মধ্যকার ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে-ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা, শোন্। পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি ?

নিবারণের মা বলিল—আছে ? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে আসবো এখনি। নতুন আছে তো মা-ঠাকরোন, না পুরনো ?

সর্বজয়া বলিল—তুই আয় না, এখুনি দেখবি। একটু পুরনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি, ধোয়া তোলা আছে।—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস নে ?

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় ধান শুকোয় মা-ঠাকরোন ? খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অমনি।

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর্‌ না, তাই গিয়ে আমায় আধ কাঠাখানেক দিয়ে যাবি ? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বিষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছিনে। টাকা নিয়ে-নিয়ে বেড়াচ্চি, তা কেউ যদি রাজী হয়! বড় মুশকিলে পড়িচি মা! নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আসবো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খাতি পারবেন মা ঠাকরোন? বড্ড মোটা।

নিমছাল-সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা নিম্‌কি-নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।···সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট। বৈকালবেলা হইতে আবার বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে। অশ্রান্ত বর্ষণ ছম-ছম ঝম-ঝম, চারিদিকে জলে থৈ-থৈ, হু-হু সাঁ-সাঁ করিয়া বহে পুবে হাওয়া, মেঘে-অন্ধকারে একাকার ভাদ্রসন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো-কালো পেঁজা-তুলার মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে।

বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। দরজা-জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্‌ হু-হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে, ছেঁড়া কাগজ-গোঁজা ভাঙা কপাটের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশি রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। শরীর দুর্ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে।

জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে। হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে। সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু? একটু ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা বড্ড জল পড়চে—একটু সরে পাশ ফের দিকি। অপু উঠিয়া বসিয়া

ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কী শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা-ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার যদি পুরনো কোঠাটা—? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে-মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও!···

তখনো ভালো করিয়া ভোর হয় নাই; ঝড় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি তখনো অল্প-অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কি-দোরে বার-বার ধাক্কা শুনিয়া আসিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ, এ সময়?

সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কী হয়েচে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্চে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি।

তার ওপর কাল রাত্রে কি-রকম কাণ্ড তো জানই? একবার শিগগির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ? দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি। চলো আমিও যাচ্চি। কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালখানা পড়ে গেল। বাবাঃ, কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি। শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা। দাঁড়াও, আমি ডাকি।

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ি আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে বাবা অপু? অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল—দিদি কী সব বকছিল জ্যাঠামশায়। নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা? …জ্বরটা একটু বেশি। আচ্ছা, কোনো ভয় নেই। ফণি, তুমি একবার চট্ করে নবাবগঞ্জ চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে, একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন— দুর্গা, ও দুর্গা? …দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন। দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশি হইয়াছে। মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতে দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু'একবার ডাকিল—ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, কথা ক'না, ও দিদি? দুর্গার সেই কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কী যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর-ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু'একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কী বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনো অনেক আছে। আজ রদ্দুর উঠেচে

দেখেচিস দিদি? এখনো আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রদ্দুর রয়েচে।

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু, একটা কথা শোন্।

—কি রে দিদি?…সে দিদির মুখের আরো কাছে মুখ লইয়া গেল।

—সেরে উঠলে আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

—দেখাবো এখন; তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ি করে।…

সারা দিনরাত কাটিয়া গেল।

ঝড়বৃষ্টি কোনো কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে শরতের জমকালো রৌদ্র!

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, এই সময় তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত স্বর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগগির, অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাপার কী দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সকরুণ আবেগে

বলিতেছে—ও দুগ্‌গা, চা' দিকি—ওমা, ভালো করে চা' একবার—ও দুগ্‌গা, একবার মা বলে ডাক!

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কী হয়েছে? সরো সরো দিকি সব। আহা, কেন সব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও? সর্বজয়া ভাশুর সম্পর্কীয় প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, আমার কী হল, মেয়ে কথা কয় না—চোখ চায় না কেন?

দুর্গা আর পৃথিবীর আলোয় চোখ চাহিল না।

আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল; তিনি আসিয়া ও রোগী দেখিয়া ব'লিলেন—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হযেছে, আর অমনি হার্টফেল করেছে। ঠিক এইরকম একটা কেস্ হয়ে গেল সেদিন দশঘরায় মুখুয্যেদের বাড়ি।···

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

* * * * * * * * * * *

সতেরো ॥ আগমনীর সুর

* * * * * * * * * * *

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না-একটা কিছু উপায় হইবে—এই কুহকে পড়িযাই সে সেখানে গিযাছিল! কিছুদিন থাকিবার পর সন্ধান পাইল যে, শহরের উকিল কি জমিদারের

বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায়-আশায় দিন-পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না!

সে পড়িল মহাবিপদে। অপরিচিত স্থান, একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন কেহ নাই। খোড়েবাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে সে স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা। অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা জমায়, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ-হৈ করিয়া কাটায়।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড়-বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে, ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত একদিন তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারির কাছে গিয়া কী লাগাইল

তাহারাই জানে। সেক্রেটারি-বাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিন দিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পর জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে আসিয়া হরিহর অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাতমুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয়ক গান করিয়াছিল। গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়। সেই টাকাটি ভাঙাইয়া কিছু পয়সা দিয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না। মাত্র দিন দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই; এতদিন কী করিয়া তাহাদের চলিতেছে। অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বার-বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা 'পদ্মপুরাণ' কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে। মাঝে-মাঝে সে যে বাপের বাক্সদপ্তর খুলিয়া লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে।

বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা

বটতলার পদ্যে 'পদ্মপুরাণ' পড়িবার জন্য লইয়া আসে। অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল; রোজ-রোজ পড়ে—কুচুনী-পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারি আমোদ হয়। হরিহর বলে—বইখানা দাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে! অবশেষে একখানা 'পদ্মপুরাণ' তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই সর্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বার-বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভালো দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সেসব তো দূরের কথা, কী করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে সেটাই এখন সমস্যা।

সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে-রাত্রের মতো আশ্রয় লইল। ভালো ঘুম হইল না· বাড়িতে কী করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া সে আবার লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে লাগিল। একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একটা কাজের সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহদেবতার পূজা পাঠ করিবার জন্য এমন একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে

সে সেখানে গেল; বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশটাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন। গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী মিলিল। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভালো কাপড় ও ভালো দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা কিনিল। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুক্‌টাক্ দু'একটা জিনিস, সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল —একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে-হাটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পোঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না; দেখা হইলেও সে উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া হন-হন করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে-ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা! বাঁশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের

ওপর। ভুবন কাকা কাটাবেনও না, মুশকিল হয়েছে। আচ্ছা—পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল—ও মা দুগ্‌গা, ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। হরিহর মৃদু হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভালো তো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি? সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারি পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল—এসো, ঘরে এসো।

স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খট্‌কা লাগিল না; তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই বুঝি ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিবে।

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি এনেচ বাবা আমার জন্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—বেশ কাঁঠালের চাকি-বেলুন এনিচি এবার।…পরে সতৃষ্ণ-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া নিরাশামিশ্রিত-স্বরে বলিল—কৈ, হ্যাঁগা, অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে?

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে

গো? মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে গো। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

গাঙ্গুলি বাড়ির পূজা অনেক কালের।

আঁসমালীর দীনু সানাইদার অন্য-অন্য বৎসরের মতো এবারও রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ-সুর বাজিয়া ওঠে।

নতুন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে—এগিয়ে চল, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা।

* * * * * * * * * *

আঠারো ॥ এই নিশ্চিন্দিপুর

* * * * * * * * * *

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার রাত্রে যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এ-দেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এ-দেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্পবয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে-দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনো কাহারও অভাব নাই—দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব

দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবে বলিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঠালকাঠের বড় তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল—খবর পাইয়া এপাড়া-ওপাড়া হইতে খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা এবং কত অল্প-খরচে এখানে সংসার চলে, সে-বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে-মুখে তাঁহারা দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কী দেশে যে থাকতে বলব? তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পেতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি, এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো, যদি ভগবান দিন দেন।

রাণু কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। বলিল—

হ্যাঁরে অপু, তোরা কি এ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?
অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিগগেস করো মাকে।
তবুও রাণু বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণু অবাক হইয়া গেল।
অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল—কবে যাবি রে?
—সামনের বুধবারের পরের বুধবার।
—আসবি নে কখনো?
রাণুর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে-গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?
অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা! বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে!
স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সারিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?…
এবার রামনবমী, দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে-পরে পড়িল। প্রতিবৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত।



চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কমেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ির সেই দোচলা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সে-ও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনির ভয়ে মাঠ-বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল; এখন তাহার সে-কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ি ডাইনি নয়, রাক্ষুসী নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—কুশ্রী, গরীব, অসহায়—ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না; থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে, সৎকারের লোক হয় না?··· পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আম্‌সি-আমচুর তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে-হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। গত বছরের চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু, একটা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস্? অপু

প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানুসে-পুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে! আমি পারব না যা। কেন রাম-রাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ, আর যুদ্ধু—ছেলের যা কাণ্ড! কেন, ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভালো হল না?…দিদির শিল্পানুভূতিশক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।…

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে; পাখির ডাকে, সদ্যফোটা গুড়কলমি ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয়, যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে কত খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনো, কখনো কি সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না?··চড়ক দেখিয়া, নানা গাঁয়ের চাষার ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড়-জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে-বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারে মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রঙ-করা হাঁড়ি ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো-না-কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি-ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দুপয়সায় তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে-ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি

এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয়, তবে বাবাকে বলবো—আমি মেলা দেখবো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চলে যাই—না হয় দুদিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ি থেকে যাবো!

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল।

কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যাঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়িঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আম-বাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই-ভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কী সুন্দর দেখায়! ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া চুম্‌কি-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে!

কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর। যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরে দাওয়ার পাশে বনের ধারে অমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে? নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল-রেল খেলিতে পারিবে? কদমতলায় সায়রের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রাণুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা—কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

* * * * * * * * * *

ঊনিশ ॥ মনে পড়ে

* * * * * * * * * *

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যের তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কী লইয়া যাইতে পারে-না-পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে; উঁচু তাকের একটা ছোট মাটির কলসি সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কী জিনিস গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেঝে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। নোনা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা যে কী তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা—আর বছর যেটা সেজঠাকুরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল।

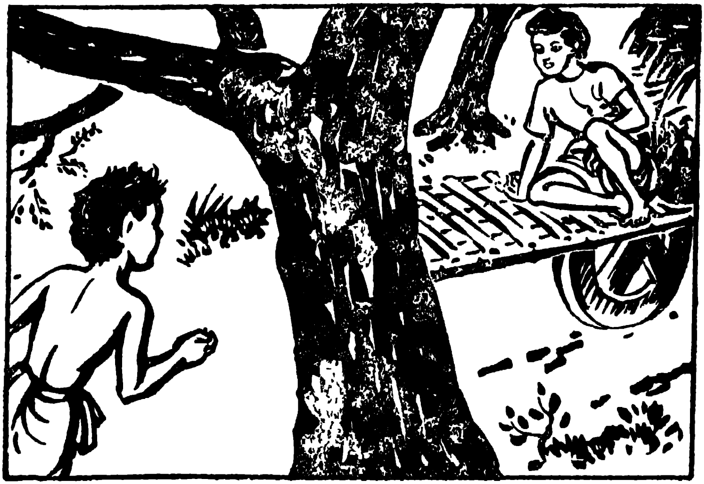
দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অপু অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, চৈত্র-দুপুরের তপ্ত-রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন-শন শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপনমনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে-ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন-হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মনে-মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, এমন কি মাকেও না।···

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে, হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ি রওনা হইল।

সকালের দিকে আকাশে একটু-একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া বৈশাখী মধ্যাহ্নের পরিপূর্ণ প্রখর রৌদ্র গাছপালায় পথে-মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে।



পটু গাড়ির পিছনে-পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা, এবার বারোয়ারীতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুনতে পেলিনে এবার !

অপু বলিল–তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি, জানলি ?···

আবার সেই চড়ক-তলার মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে ; কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে।

হরিহর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার যেন কেমন-কেমন

ঠেকিতেছিল।···কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম তো একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্‌-টিম্‌ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে তাহা চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি আতুরী-বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল।

গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল—যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু দীনতা হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নবীন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিবে অপু সেই আশায় বসিয়াছিল; গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়া হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে-আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত।

প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো; দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্সের মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কী করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটিগুলি চিকচিক করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট-খট শব্দ করিতেছে।

ইষ্টিশান! ইষ্টিশান!···বেশি দেরি নয়—কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়—চড়িবেও।

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল—স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের একটি বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল—বৌটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। মা

খিচুড়ির চাল-ডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে-সাতটায় ট্রেন আসিল।

অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল—খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও চেঁচাইয়া লোকজনদের হঠাইয়া দিতেছিল। ইস্, কতবড় ট্রেনখানা। কি ভয়ানক শব্দ। সামনের প্রকাণ্ড কালো-মতো ধোঁয়া-ওড়ানো গাড়িটাকেই তাহা হইলে ইঞ্জিন বলে? উঃ। কী কাণ্ড।

হরিবপুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়িতে হৈ-হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানলা-দরজা সব হুবহু।

এই ভারি গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো না-ও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে—ওগো, তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না।

তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস



মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটি কী কৃপার পাত্র। আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কোন সুখে ?··· হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব ঝাঁকানি আর দুলুনি। দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের-গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ। এরই নাম রেলগাড়ি।

উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাপ, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, ছোটোখাটো চাষাদের ঘর—সব একাকার করিয়া দিতেছে। গাড়ির তলায় জাঁতো-পেষার মতো একটানা একটা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

সে আর দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে-খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!···তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে! তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালোবাসিত না, মা নয়, বাবা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়। দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে-কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু

সত্যসত্যই দিদির সহিত তাহার চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, তবু তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে···আতুরী ডাইনি·· নদীর ঘাট ··তাহাদের কোঠাবাড়িটা·· চালতেতলার পথ·· রাণুদি··· কত বৈকাল, কত দুপুর···কতদিনের কত হাসিখেলা···পটু··· দিদির মুখ···দিদির কত না-মেটা সাধ।···
দিদি যেন এখনো একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।···
পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যকার অস্ফুরিত ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার-বার বলিতে চাহিল —আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।



সত্যই সে ভোলে নাই।

•

বড় হইয়া নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার বড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব-নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীয়মান চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, অদূরে অস্পষ্ট-দেখিতে-পাওয়া বনভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, এক পুরনো কোঠায়, অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীবঘরের মেয়ের কথা—তাহার হারানো স্মৃতি।



অপু, সেরে উঠলে, আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ?…

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালখানা দেখিতে দেখিতে অস্পষ্ট হইতে-হইতে শেষে একেবারে মিলাইয়া গেল ॥

